Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের ব্যবহার

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.11
Pages	২৫৩-২৭১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা সাহিত্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের ব্যবহার

অলোক কুমার চক্রবর্ত্তী*

সারসংক্ষেপ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা উল্লেখযোগ্য সৃজন-উৎস; যার মধ্য দিয়ে জীবনবীক্ষার বিবিধ বিষয়, সাহিত্যসৃষ্টির নানামুখী সম্ভাবনাকে সাহিত্যিকেরা তুলে ধরেছেন। ব্যক্তি তার অন্তর্গূঢ় সত্তায় ও অবচেতনে শুধু নিজের অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞান বহন করেন না; সৃষ্টিলগ্নে তার হৃদয় হয়ে ওঠে সামূহিক চৈতন্যের আধার। এই সামূহিক চৈতন্যের অংশ মিথ বিশেষত, ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথায় সাহিত্যিকেরা সমকালীন জীবন ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে অন্তর্গূঢ় অভীপ্সার প্রতিমান অন্বেষণ করেছেন। এ প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের নানাবিধ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মিথ-অনুষঙ্গী সাহিত্য শিল্পীর সৃজনক্ষম প্রজ্ঞার অনন্য শিল্পবীক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে।

বোধের ত্রিবিক্রমী[১] স্তরের উত্তরণের পর্যায়ে উত্তুঙ্গ ফসলরূপে প্রতিতুলিত অনুষঙ্গরূপে সাহিত্যের যে প্রকাশ, এক অর্থে তা 'যজ্ঞের ফলাগমের হোমশিখা' রূপে আখ্যায়িত হতে পারে। এই আগুন বৈদিক যজ্ঞের আহুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কালের নিরিখে এই যজ্ঞের বহ্নিশিখা আহুত-অনাহুত সকল স্তর মন্থন করেছে। আত্মারাম-আত্মারামেশ্বর; এই যুগপৎ আত্মায় 'অরণিমন্থনে' চূড়াধ্বজায় ময়ূরপুচ্ছ সংযোজন করে নীলকণ্ঠ মানবাত্মার চলমান বা প্রবহমান ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেছে। ফলে মন্থনকৃত বিষ ও অমৃত ভোগ-বাসনা চরিতার্থতার স্বরূপরূপে প্রকটিত; যা প্রকাশ পেয়েছে বর্তমান, অতীত ও ভবিতব্যকে স্মরণের মধ্য দিয়ে। মিথের স্মরণ গ্রহণ ও প্রত্যাশার স্বরূপ ব্যাখ্যানে উল্লিখিত বিষয় যেমন প্রতিস্থাপিত হয়, তেমনি করে তেমনি উঠে আসে মানবজাতির আদি উৎস। সমালোচকের ভাষায়-

> পাশ্চাত্য নৃতাত্ত্বিক ও অন্য মতাবলম্বী 'মিথ' ব্যাখ্যাতাগণ মিথকে খুব নিগূঢ়ভাবে মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস বললেও – তাকে কাল-পরম্পরাগত মানব-ইতিহাসের রূপে কখনো বিচার করেননি। তাঁদের দৃষ্টিতে মিথ হলো সমগ্র মানবজাতির বা মনুষ্যত্বের আদি-ইতিহাস। (কমলেশ, ১৯৮০ : ৩১)

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা সেনানিবাস।

আদিম মানুষ প্রকৃতির অনধিগম্য বিষয়াবলিকে ব্যাখ্যা করবার লক্ষ্যে যে সকল মনসিজ কাহিনি এবং তৎ-নিরূপিত আচার বিধি পালনকে তাদের জাগতিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য উপকরণরূপে গ্রহণ করেছিল সে সকল বিচিত্র মনো-অভিব্যক্তিই কালস্রোতে ঘনীভূত হয়ে মিথকথায় পরিণত হয়। অর্থাৎ, এই মিথকথার মূলে প্রোথিত থাকে এক অন্তর্শায়িত ধারণা। মিথকথা বৈশ্বিক জলবায়ুতে প্রোথিত হয়ে অনুভূতিরঞ্জিত অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত হয়ে এক নতুন অবভাসিত স্তরকে অতিক্রম করে। মূলত এই প্রক্রিয়াটি সামূহিক চৈতন্যের পর্যায়ে অর্ন্তভুক্ত এবং এর রূপপ্রকাশে প্রত্নস্মৃতিই উঠে আসে। এই স্মৃতির মানদণ্ডেই উদ্ভাসিত হয় চৈতন্যের সামূহিক আধার। অস্তিত্বসচেতন শিল্পস্রষ্টা তার চেতনায় বদ্ধমূল মিথ-ঐতিহ্যকে বা সমগ্র জাতির কল্পনাসৃষ্ট মিথকে স্ব-স্ব সময়ের উপযোগী সজীবতায় আর সংবেদনায় সর্বোপরি, সমকালীন জীবন-পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত করেন। মিথকথার অন্তস্তলে থাকে ধর্মীয় প্রতীতি. কিংবদন্তি এবং বাস্তব ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ। কিন্তু মিথ ইতিহাস নয়, ইতিহাসের একটি প্রত্নপ্রতিমা যা মিথকে তার কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মিথকথায় অনিবার্যভাবে লুকিয়ে থাকে ইতিহাসের সংকেত এবং প্রকাশিত হয় পরিবর্তনশীল যুগচেতনার সুস্পষ্ট ছাপ। এই ছাপের মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের হদিশ মেলে এবং জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পরিকাঠামো চিহ্নায়িত হয়।

মিথের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে যে স্বরূপলক্ষণ প্রকাশিত হয়, তা হলো – আদিম মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির দুর্বোধ্য বিষয়কে ঘটনার অন্তরালে অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বরূপে কল্পনা করে এবং কালপরম্পরায় কল্পনাকৃত অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বই বিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে দেবতায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত রূপের নানাবিধ গল্পই মিথকথায় পরিণত হয়। এই ব্যাপারটি পৃথিবীর সমস্ত জাতি এবং তাদের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটেছে। মানুষের কালানুক্রমিক ইতিহাসে ব্যবহারিক সংস্কৃতির যে ক্রমবিবর্তন, সেই উপলক্ষগুলিই যুগপরম্পরায় এক একটি জাতি নিজের মতো করে সঞ্চিত করেছে স্বীয় ঐতিহ্যে। সুতরাং, পৃথিবীর সকল সভ্যতা ও লিখিত সাহিত্যের পশ্চাতে আছে এক সুদূরপ্রসারী লোকঐতিহ্য। ঐতিহ্য ছাড়া সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরে, জীবনচর্চার নিয়ম ও জীবনচর্চার ফসল একত্রে সংস্কৃতির বুনিয়াদ গড়ে তোলে। মুলত সংস্কৃতি ঐতিহ্যবাদী কিন্তু ঐতিহ্যনিষ্ঠ নয়। আর এই ঐতিহ্য আনন্দদায়ক প্রত্নতাত্ত্বিক পুনর্গঠনের কথাই স্মরণ করায়। মিথের বহমানতার শিকড় ঐতিহ্যের খুব গভীরে প্রবিষ্ট না থাকলেও যুগে যুগে তার আর্কেটাইপের অনুধ্যান শিল্পের ঈশ্বর লালন করেছে তার নিজস্বতায়, আবিষ্ট করে রেখেছে সত্তায়। এই আবেশের অন্তর্মূলে রয়েছে ঐতিহ্যাশ্রিত সংস্কৃতির ও সামষ্টিক অনুভূতিরঞ্জিত মনোভাব। মনোবিজ্ঞানীরা এই রঞ্জিত মনোভাবের উৎস সন্ধানে ত্রি-স্তরিক অবকাঠামোর সন্ধান পেয়েছেন :

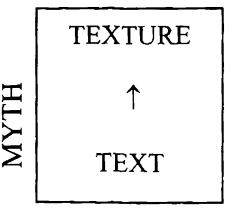

(চন্দ্রমল্লী, ২০০১ ; ৬)

উল্লিখিত 'স্তরগুলোকে 'অন্তর্লীন প্রেক্ষিত', 'মূল উপজীব্য' এবং 'বহির্বিন্যাস' বলে অভিহিত করা হয়। ঐতিহ্যের অন্তর্মূলে থাকে শেকড়। ঐতিহ্যের উপাংশ হিসেবে চিহ্নিত হয় কাহিনি আর বহির্বিন্যাসের চূড়ান্তলগ্নে এসে ঘটে যায় প্রাসঙ্গিক রূপান্তর'। (চন্দ্রমল্লী, ২০০১:৬) বিখ্যাত মিথতাত্ত্বিক রলাঁ বার্তে-র ব্যাখ্যা এই ক্ষেত্রে গভীরভাবে স্মরণযোগ্য:

> In myth, we find again the tri-dimensional pattern ... the signifier, the signified and the sign. But myth is a peculiar system, in that it is constructed from a semiological chain which existed before it: it is a second order semiological system. That which is a sign (namely the associative that of a concept and an image) in the first system becomes a mere signifier in the second. We must here recall that materials of mythical speech (the language itself, photography, painting, posters, rituals, object etc.) however different at the start; are reduced to a pure, signifying functionas soon as they are caught by myth. Myth seems in them only the same raw-material; their unity is that they all come down to the status of a mere language (Roland, 1972 : 114)

মানুষ কার্যকারণসন্ধানী প্রাণী। মানুষের মনের গভীরতর বৈশিষ্ট্য হলো – তারা যুক্তিগতভাবে ব্যাখ্যার অতীত ধারণা এবং অভিজ্ঞতা অনুভব করার ক্ষমতা ধারণ করে থাকে। যুগ-যুগান্তরব্যাপী মানুষ সহজেই হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে এবং সভ্যতার শুরু থেকে গল্প তৈরি করেছে। এই গল্পসৃষ্টির মূলে রয়েছে এক বিশেষ বোধ; তা হলো – অস্তিত্বসচেতনতা, দ্বান্দ্বিকতা ও সংগ্রামমুখর চেতনা। এই চেতনাই আমাদের জীবনকে কালের নিরিখে একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপিত করেছে। এই বৃহত্তর জীবনের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ব্যক্তি তার অন্তর্গূঢ় সত্তায়, তার অবচেতনে শুধু নিজস্ব অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞানকে বহন করেনি; সৃষ্টিমুহূর্তে তার বোধ হয়ে উঠেছে সামূহিক চৈতন্যের আধার। এই সামূহিক চৈতন্য আমাদের জীবন ও তার মূল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছে।

এই বোধের বিকাশ আমরা দেখি আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির মধ্যে; যেখানে বিবৃত হয়েছে আবহমান মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। জীবনের নান্দনিক দিকগুলোকে নবীন প্রত্যয়ে সাজিয়ে তুলেছে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির প্রবহমানতা। মিথকথা এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অংশ এবং তা জীবনের সাথে সম্পর্কিত। তাইতো সমকালীন জীবন ও বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে শিল্পস্রষ্টা যখন তার অন্তর্গূঢ় অভীপ্সার রূপায়ণ অসম্ভব বোধ করেন, তখন তার অভীপ্সার প্রতিমান অন্বেষণের মাধ্যম হয় মিথ। সংস্কৃতির মৌল উপাদান মিথ তখন সংস্কৃতিতে পরম্পরার একটি আন্তঃযোগাযোগ স্থাপন করে। যেমন :

> মিথ – যা এক সমষ্টিগত অভিধা, যোগাযোগেরও একটি উপায়। প্রত্যেক সমাজেরই মিথ থাকে, আর তা মানব সংস্কৃতির মৌল উপাদানও বটে। গড়নের দিক থেকে প্রতীকী ন্যারেটিভের অন্তর্গত এই মিথ। অন্যান্য ন্যারেটিভ আঙ্গিক যেমন – Fable, Fairytales, Folktale, Saga, Epie, Legend-এর সাথে মিথের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই রয়েছে। ন্যারেটিভ সমূহের মধ্যে যদি সত্য ও কল্পিত – এ ধরণের বিভাজন করা হয় তবে মিথকে সত্যশ্রেণীর আওতাভুক্ত করা যাবে। (নুরুল, ১৯৯২ : ২৪০)

মিথকথার অন্তস্তলে ধ্বনিত হয় দিব্যজগৎ ও আনন্দের কথা। এই আনন্দ বহির্জগৎকে দিয়েছে নতুন মাত্রা; অনাস্বাদিত নান্দনিকতায় তা স্পর্শ করেছে নানান ব্যঞ্জনার্থের অন্তস্তল। বর্তমান যে বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিকতা, তার আগমনের পূর্বে সব সমাজব্যবস্থায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কৃত্যানুষ্ঠানে পুরাণতত্ত্বকে অবহিত করত – যা এখনও করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। এর মূলে রয়েছে দিব্যজগতের সাথে এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়াস। এই প্রয়াস নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে জগৎকে দেখার বা অনুভব করার আকাঙ্ক্ষায়। অস্তিত্ব সচেতনতায় মানুষ আবেগ-সংবেদনার ভাষারূপ নির্মাণে মিথকে গ্রহণ করেছে আপন আনন্দে, বিচিত্র অনুভবে। Karen Armstrong এ বিষয়ে জানাচ্ছেন :

> এই দিব্য জগতের অঙ্গীভূত হয়েই কেবল নশ্বর ভঙ্গুর মানুষ তাদের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলতে পারে। মানুষ অন্তর্জ্ঞানে যা অনুভব করে পুরাণ তাকেই পরিপূর্ণ সুনির্দিষ্ট আকৃতি এবং রূপ দান করে। পুরাণ তাদের কাছে দেবতাদের আচরণ ব্যাখ্যা করে, অলস অনুসন্ধিৎসা থেকে না বা এসব আকর্ষণীয় শোনায় বলে না, যাতে এসব শক্তিশালী সত্তাকে মানুষ নারীপুরুষ নির্বিশেষে অনুকরণ করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের মাঝে দিব্যসত্তাকে অনুভব করতে পারে। (সাদেকুল [অনু], ২০০৯ : ১১)

এই দিব্যসত্তা অনুভবের পথ বেয়েই সাহিত্যে মিথের আধ্যাত্মিক চরিত্রগুলি জীবন্ত মানুষের মধ্যে এসেছে সামর্থ্যের প্রতিচ্ছবি রূপে, এসেছে মঙ্গল ও নতুন জীবনের বার্তা নিয়ে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত 'ঋষ্যশৃঙ্গ মিথ' বিষয়ে আলোচনার তথা ব্যবহারিক পর্যায়ে এই মিথিক পন্থার অবস্থান, ক্রম বিবর্তন

তুলে ধরতে সচেষ্ট হব। আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে উল্লিখিত বিষয়ের ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তন ও তার ব্যবহারের দিকে। 'ঋষ্যশৃঙ্গ' মিথকথাটি ভারতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিশ শতকীয় জটিল মানবমনস্তত্ত্ব অবচেতনালালিত প্রত্ন-কল্পনার জালিকা বিন্যাসকে আয়ত্তের প্রয়োজনে আশ্রয় করেছে মিথিক পন্থা। এই মিথকথা সাহিত্যের প্রাকরণিক অভিব্যক্তির বহুধা অভিধায় সিক্ত করে সাহিত্যলক্ষ্মীর সাধকেরা নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। মহাকবি বাল্মীকি যে শরাহত ক্রৌঞ্চকে দেখে সহসা অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করেই উপলব্ধি করলেন যে, সে অভিশাপ শুধু পরিমিত বাকপুঞ্জেই নয়, শব্দ শৃঙ্খলার অর্থসমন্বিত মালাও নয়; তা কবিতা, শ্লোক, অর্থের সাথে সুর, বিবৃতির সাথে রস :

তসোত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদিবীক্ষতঃ।
শোকের্তানস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতংময়া।

অর্থাৎ বাল্মীকি ব্যাধের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া, আমি পক্ষীর শোকে আকুলচিত্তে কি কার্য করিলাম, বারংবার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। (অসিতকুমার, ২০০১-০২ : ২)

এই 'কিমিদং ব্যাহৃতংময়া'-র সাহায্যে ঐতিহ্য অনুবর্তনের একটি ধারা সূচিত হলো। সূচনাকারী এই পথ ধারাবাহিক বিবর্তনে মিথিকপন্থায় অনুরণিত। এই সমুন্নত ঐতিহ্যের অনুবর্তন মীমাংসা শাস্ত্রে; বিশেষভাবে বেদকে যে ত্রয়ী (মিতত্ব, অমিতত্ব, স্বরত্ব রূপ) বলা হয়, অনেকাংশে তা 'ত্রয়ী'র বাহ্যিক স্বরূপের মতো। আর এর স্বরূপগত লক্ষণসমূহ পাঁচটি ভাগে যথাক্রমে: সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত অভিধায় অভিষিক্ত করে এক অনন্য তাৎপর্যে ভূষিত করা হয়। যার ফলে বাল্মীকির 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম মোহিতম'; এই 'মোহিতম'-ই বিন্যস্ত হতে হতে সুদূরে পথ চলার অবতাররূপে কল্পিত হয়ে থাকে।

ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের উৎসভূমি *রামায়ণ* ও *মহাভারত*। *রামায়ণে* (১/১৪) ও *মহাভারতে* (বনপর্ব) ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনি বর্ণিলভাবে বর্ণিত হয়েছে:

> ঋষি কশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডক মুনির ঔরসে দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম ভাগের কন্যা মৃগরূপিণী স্বর্ণমুখীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। স্বর্ণমুখী শাপগ্রস্ত হরিণীরূপে ঋষ্যশৃঙ্গকে জন্ম দেন বিধায় তার মস্তকে শৃঙ্গ ছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ কৌশিকী নদীর তীরে পিতার তপোবনে একেবারে নিঃসঙ্গ ভাবে প্রতিপালিত হন। তিনি ভোগসুখ ও নারী সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন। রাজা দশরথের বন্ধু অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি রোধ কল্পে ঋষিদের পরামর্শে মন্ত্রীদের সহায়তায় চিত্তোন্মাদক ইন্দ্রিয়ভোগ্য বারাঙ্গনারা ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে ঋষি বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিতে নিয়ে আসেন। বারাঙ্গনাদের দেহবল্লরীর ছন্দে মোহিত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে বৃষ্টি নিয়ে

আসেন। পরবর্তীতে রাজা লোমপাদের পালিত কন্যা (দশরথের ঔরসজাত) শান্তার সাথে বিয়ে হয়। রাজা দশরথের পুত্র কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন এবং তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে দশরথের পুত্রকামনা সার্থক করেন। (সুধীরচন্দ্র, ১৪১৫ : ৬০)

জাতকের দুটি গল্প যথাক্রমে 'অলম্বুষা ও নলিনিকা'-তে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি বিদ্যমান। উল্লেখ্য, *জাতকের* পূর্বস্তর 'ইত্যুক্ত' ও উত্তরস্তর 'অদ্ভুতধর্ম ও বৈদল্য'- তে আলোচ্য বিষয়টির সাক্ষাৎ মেলে। (*ত্রিপিটকের* প্রধান তিনটি ধারা : বিনয়পিটক, সূত্তপিটক, অভিধম্মপিটক। *জাতক* সূত্তপিটকের 'খুদ্দকনিকায়'-এর অন্তর্গত) পাশ্চাত্যের ইউনিকর্নের সাথেও ঋষ্যশৃঙ্গের সাদৃশ্য কল্পনা করা যায়। কারণ, তাৎপর্য বিচারে উভয়েই শুদ্ধ প্রেম ও মানবতার প্রতীক। ঋষ্যশৃঙ্গ যেন *ফেটিসদের*[২] (ক্লোথো, ল্যাচেসিস, আট্রোপোস এই তিন বোন ফেটিস নামে পরিচিত) ভিন্নরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের মধ্যে যে বিশ্বপ্রসারী ভাবসম্পদ বিদ্যমান, তাকেই ব্যবহার করে আধুনিকালে বাংলা সাহিত্যের একাধিক শীর্ষস্থানীয় শিল্পী অনন্য প্রকরণে বহুবর্ণিল মানবীয় জীবনদর্শনকে ধারণ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন; যার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথ হয়ে উঠেছে সর্বজনীন এক সম্পদে। বাংলা সাহিত্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা যেসব সাহিত্যমাধ্যমে শিল্পরূপ অর্জন করেছে সেগুলো হচ্ছে : রূপরেখায় ফুটে উঠেছে তা হলো : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১), 'পতিতা' (১৩০৪ বাংলা), রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-১৮৯৪) *ঋষ্যশৃঙ্গ* (১৮৯২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'আঁধারে আলো' গল্প (১৩২১ বাংলা), বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬) ও *ইক্কাকু সেন্নিন* (অনুবাদ-১৯৭১), সমরেশ মজুমদারের (১৩৪১ বাংলা) *নবীন সন্ন্যাসী* (১৯৮৮)। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'শেষকথা' (১৩৪৬ বাংলা) ও 'শকুন্তলা' (১৩০৯ বাংলা) তে আলোচ্য বিষয় নতুন মাত্রা লাভ করেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে উল্লিখিত রচনাসমূহে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। বিবর্তনের এই রূপরেখা চিহ্নিত করতে আমরা ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের ব্যবহার-বিষয়ক আলোচনা (পতিতা, তপস্বী ও তরঙ্গিণী ও নবীন সন্ন্যাসী) করতে সচেষ্ট হব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অসামান্য কবিতা 'পতিতা' (১৩০৪ বাংলা)। বহুভোগ্যা নারীর একনিষ্ঠ আত্মিক প্রেমানুভূতি, নতুনভাবে নিজেকে সৃষ্টি করার প্রত্যয়, প্রপঞ্চে নারীরূপে স্বীয় অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। আলোচ্য কবিতায় কবি সত্তানুসন্ধানী এক নারীর শাশ্বত মানবীয় অনুভূতিকে রাঙিয়ে তুলেছেন। পতিতা বহুভোগ্যা হলেও স্বীয় জীবন ও সত্তার কাছে তার একটি নির্দিষ্ট অবস্থান রয়েছে। প্রথাগত সমাজ থেকে এই স্বীকৃতিটুকু না পেলেও অপাপবিদ্ধ ঋষির কাছ থেকে যে স্বীকৃতি পেয়েছে, তা-ই তার মানবীয় আকুতিকে প্রশমিত করেছে। কবির ভাষায় :

সাধক বিহীন একক দেবতা
ঘুমাতে ছিলেন সাগর কূলে
ঋষির বালক পুলকে তাহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভক্ত প্রাণে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯ : ১৩৩-১৪১)

মানবীয় এই আকুতি আরও গভীর হয়ে উঠেছে আত্মসংশয়ে। যেমন :

না হয় দেবতা আমাতে নাই
মাটি দিয়ে তবু গড়ে তো প্রতিমা,
সাধকেরা পূজা করে তো তাই।
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯ : ১৩৩-১৪১)

ঋষির তনয় বহুভোগ্যা নারীকে পূজা করেছে, মানবীয় সত্তাকে বরণ করেছে, আত্মোপলব্ধির দ্বারা নিজের অবস্থান যে সে ক্ষণিকের জন্য চিহ্নিত করেছে এই-ই প্রাপ্তি। সুষুপ্ত মানবাত্মায় বোধনের সুর ধ্বনিত হয়ে ত্যক্ত জীবনে পরিতৃপ্তির ফুল ফুটিয়েছেন কবিগুরু। 'পতিতা' কবিতায় এই পরিতৃপ্তির সুরই ধ্বনিত হয়েছে আর বিধৃত হয়েছে প্রাপ্তির আনন্দের মধ্যে নবজন্মের। কবি এ বিষয়ে জানাচ্ছেন :

মনে হল, মোর নবজন্মের
উদয়শৈল উজল করি
শিশিরধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৯ : ১৩৩-১৪১)

বহুভোগের পঙ্কিলতার অন্তরালে মানবাত্মার আনন্দ-জাগরণে নবীন জীবন প্রাপ্তিতে বিমূর্ত প্রেমকেই মুখ্য করে দেখালেন রবীন্দ্রনাথ। মিথের অন্তরালে ফুটে উঠল মানব-অন্তরের চিরন্তন অনুভূতির ব্যঞ্জনার্থ।

ছোটগল্পে জীবন রূপায়ণে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এক ভিন্ন আবহ সৃষ্টি করেছেন। আবহমান বাঙালির চিরায়ত আবেগ, মানব মনস্তত্ত্ব তাঁর গল্পের অন্যতম বিষয়। 'আঁধারে আলো' গল্পটিতেও এই মানব মনস্তত্ত্বের স্বরূপ ধরা পড়েছে। সেইসাথে আলোচ্য ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথাও এসেছে আভাসিত মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বুদ্ধদেব বসু কিংবা সমরেশ মজুমদারের মতো ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা

শরৎচন্দ্রের গল্পে সরাসরি প্রযুক্ত হয়নি। কিন্তু কাহিনির সাংগঠনিক পর্যায়ে এসে বিবর্তনের পথ বেয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনিই জীবন্ত মানুষের আবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'সত্যেন্দ্র-বিজলী-রাধারাণী' যেন 'ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণী-শান্তার' প্রতিকৃতি হিসেবে কাজ করেছে। আমরা লক্ষ করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিতা' কবিতায় যে নারী সহমর্মিতা চেয়েছে, একদিনের জন্য হলেও পূজ্য হয়েছে, স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠা করেছে নারীত্বের; শরৎচন্দ্রের বিজলী সেই ঘরানার নয়। সে পৌরাণিক আখ্যানের তরঙ্গিণীর মতোই। বারগায়িকা হলেও প্রেমঅনভিজ্ঞ সত্যেন্দ্রের দর্শনে তার মধ্যে কামভাব তিরোহিত হয়ে সাত্ত্বিক প্রেমভাবের উদয় হয়েছে। সত্যেন্দ্র বিজলীকে পরিত্যাগ করলেও বারগায়িকা বিজলী সত্যেন্দ্রর মোহ ও ঘৃণার মধ্যে অনুভব করেছে শাশ্বত প্রেম। এই প্রেমের কল্যাণেই বিজলী বহুভোগ্যা জীবন পরিত্যাগ করে এক নতুন বলয়ে প্রবেশ করে। এ বলয় একান্তই অনুভূত প্রেমের। সত্যেন্দ্র - বিজলীর গঙ্গাঘাটে দর্শন এবং প্রাথমিক কথোপকথনে তাদের মধ্যে কামনাভাবেরই উদ্রেক করেছে। এ তো মানবাত্মার চিরায়ত কামনা। তরঙ্গিণীর মতোই সত্যেন্দ্রের দর্শনে তার মধ্যে এক অভিনব রূপান্তর ঘটেছে। প্রেমের স্তরে পৌঁছাবার যে সূত্র-কামনা তা বিজলী প্রকাশ করেছে হৃদয়োচ্ছ্বাসে। যেমন দেখি, ঋষ্যশৃঙ্গ দর্শনে তরঙ্গিণীর মনোজাগরণ। কামনার কালীদহে বিজলীরও হৃদয় তরঙ্গায়িত হয়েছে, হয়েছে সত্যেন্দ্রের। প্রথমে কামনার বিলাস-সজ্জায় ছলনাকেই স্থান দেওয়া হয়েছে। এ যেন 'পতিতার' প্রাথমিক স্বরূপ; ঋষ্যশৃঙ্গকে আকৃষ্ট করার প্রথম সোপান :

> পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোর বাগানে? ... আপনি তো চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্বাক মরাল - গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল শব্দে-অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ-ওরে অন্ধ যুবক! সাবধান ! এ-সব ছলনা - সব ফাঁকি, ... (শরৎচন্দ্র, ১৯৯৯ : ৭৭৪)

কিন্তু সত্যেন্দ্র যখন বিজলীর পরিচয় পেয়েছে তখন তার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল হয়ে উঠেছে। বিজলীর প্রতি সে যা অনুভব করেছে তা তার মোহ নয়, প্রেম। পবিত্র এক হৃদয়ানুভূতি সে অনুভব করেছে অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের মতো। কামনার বহ্নিশিখা তার অন্তরের কামসত্তাকে পুড়িয়ে শাশ্বত প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছে :

> সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা - কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না। যাহা ছিল – তাহা সত্যিই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুক জোড়া স্নেহ। (শরৎচন্দ্র, ১৯৯৯ : ৭৭৬)

সত্যেন্দ্রের ন্যায় একই অনুভূতি বিজলীও অনুভব করেছে। দীর্ঘ চার বছর পরে তাদের সাক্ষাৎ প্রেমের শাশ্বত চিত্রকেই তারা তুলে ধরেছে। উল্লেখ্য, এখানেই রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' ও শরৎচন্দ্রের 'বিজলী' যেন একই বিন্দুতে এসে অবস্থান গ্রহণ

করে। বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতার পথ ধরেই বহুভোগ্যা রমণীরা নিষ্কাম প্রেমের স্পর্শে আলোকিত পথে অগ্রসর হয়েছে। আলোচ্য ব্যাখ্যানে সবচেয়ে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে বিমূর্ত আত্মসমর্থন – যা আমরা বুদ্ধদেব ও সমরেশ-এ লক্ষ করি। ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমরা লক্ষ করি সত্যেন্দ্রের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। সূক্ষ্ম প্রেমবোধ তারও জেগেছে বিজলীর কল্পনায়। তাই গল্পকার আমাদের শোনান :

> সে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে সে এই-রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত এক খণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে। (শরৎচন্দ্র, ১৯৯৯ : ৭৭৪)

প্রথাগত জীবনে কামরূপে যে আঁধার তাতে আলো জ্বেলেছে প্রেম। বিজলী-সত্যেন্দ্রের এই মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছে প্রেম। এই প্রেম-ই তাদের কাছে উপাস্য হয়ে ধরা দিয়েছে নিষ্কাম চেতনার অন্যতম বিষয় হিসেবে। লক্ষ করলে দেখব তাদের উভয়ের চেতনার পরিবর্তন। সত্যেন্দ্র নামক ব্যক্তিটি যেন *কামসূত্রের* নায়ক নন, অপার প্রেম-তরঙ্গের মাঝে অপরূপ এক মাঝি। যেখানে সে যেন অপূর্ব তরঙ্গাঘাতে প্রেমের মূর্ত বিগ্রহে রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই তো এই শাশ্বত আহ্বানে বিজলী সব ছেড়েছে। কামনাহীন বিবর্তিত এক স্বচ্ছ প্রেমের আধার হয়েছে। তার বাইজীসত্তার মৃত্যু হয়ে নতুন বিজলীর জন্ম হয়েছে নিত্য ও শাশ্বত প্রেমের অনিবার্য পরিণতিতে। রাধারাণীর সাথে কথোপকথনে উঠে এসেছে সেই অনিবার্য পরিণতির ছবি।

> বিজলী এক মুহূর্তে চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিনতে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। সেদিন দর্প করে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু, সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙে দিলেন! তিনি ভেঙে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন, সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানে না বোন! ... প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েছি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেছেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সবদিকে মাটি হয়ে যেতুম ! তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম। (শরৎচন্দ্র, ১৯৯৯ : ৭৭৪)

শাশ্বত প্রেমের আহ্বানে বিজলীও সব ছেড়েছে, দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করেছে সুদূরে, অজানায়। প্রেমের এই সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে পৃথিবীর সমস্ত কামনা-বাসনা দূর হয়ে এক নতুন জীবনের স্বপ্ন-কল্পনায় প্লাবিত হয় মানবাত্মা। 'বিজলী হাসিয়া বলিল আমার নিজের বলে আর কিছু নেই'। (শরৎচন্দ্র, ১৯৯৯ : ৭৭৪)

বুদ্ধদেব বসুর ঋষ্যশৃঙ্গ মিথনির্ভর নাটক *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬)। ভারতীয় পুরাণবৃত্তের এই স্বল্পখ্যাত কাহিনিকে বুদ্ধদেব গ্রহণ করেছিলেন আত্মোদঘাটনের

আকাঙ্ক্ষায়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে নাট্যকার কাহিনি বিন্যাসে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসের কিছু চিরন্তন অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন। তিনি মিথকে ব্যবহার করেছেন আধুনিককালের জীবনযাত্রার বিভিন্ন জটিল মনস্তত্ত্ব উপস্থাপনের জন্য। কারণ, যুদ্ধ ও ধ্বংসপ্রবণ সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তবা মিথ-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া তাঁর অন্য কোন পথ ছিল না। এ বিষয়ে সমালোচক লিখেছেন :

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধ - উত্তর কালপরিসরে সমগ্র পৃথিবী-ব্যাপী ভাঙ্গা-গড়া এবং সামূহিক বৈনাশিকতার প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) দীপ্র আবির্ভাব। কালিক প্রবণতা এবং ব্যক্তিক মানসতার মিথস্ক্রিয়ায় বুদ্ধদেব বসুর চিত্তলোকে সৃষ্টি হয়েছিল সত্তাছিন্ন, শিকড়-উন্মূলিত, বিশ্বাসবিচ্যুত অনিকেত - ত্রিশঙ্কু মনোভাব। (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৭ : ৭)

বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচক Phillip Wheel Wright-এর মন্তব্যও এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

> The role of myth in great poetry of the past may throw some light upon the predicament of the poet and the unpromising estate of poetry in our non-mythological present. The poet of today and by that I mean the poetic impectus in all of us today – is profoundly inhibited by the dearth of shared Consciousness of myth. (P. W. Wright, 1976 : 265-266)

উল্লিখিত উদ্ধৃতির সাথে বুদ্ধদেব বসুর মানস-ভূমির একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং একটা অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। বিশেষত মিথ কল্পনায় বুদ্ধদেবের চিন্তার প্রগাঢ়তা প্রসঙ্গে। মূলত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা শাশ্বত অভিজ্ঞতার সাথে যতক্ষণ না মিলতে পারে ততক্ষণ সাহিত্যে তা মূল্যহীন। শাশ্বত অভিজ্ঞতার সাথে মিলনের অন্তরঙ্গ পথ হচ্ছে – মিথের সঙ্গে, মানবমনস্তত্ত্বমূলক অভিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তির নির্মোহ অভিজ্ঞতার সমন্বয়। বিশশতকে বসে বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকে নির্মাণ করলেন ফেটিসদের ধারণা থেকে আলাদা করে চেতনায় উদ্ভাসিত এক নতুন প্রমিথিউসরূপে।

> দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেমের সমস্যা নিয়ে বহুদিন থেকে বুদ্ধদেব ভাবনা চিন্তা করে আসছেন, এই সমস্যা তাকে ক্লিষ্ট করেছে, তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'তে এসে, তা যেন vision হয়ে দেখা দিল; খুঁজে পেলেন তাঁর কল্পনার archetype। অবশেষে খুলে গেল সেই আযৌবন নন্দিত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দরজা। কাম থেকে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্তিতে তৃপ্ত হল নাট্যকারের আধ্যাত্মিক অন্বেষা। যে রিক্ততা ও শূন্যতা আধুনিক চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যার প্রাবল্যে মানুষকে করে আধ্যাত্মিক - তারই প্রকাশ দেখলাম ঋষ্যশৃঙ্গে। তার মধ্যে

> অনুভব করি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ব বেদনা ও তার থেকে উত্তরণ। প্রাণিকতার স্তর থেকে উত্তরণ ঘটে গেল আধ্যাত্মিক জীবনে। (বিমলভূষণ, ১৯৮৭ : ৩৪)

পৌরাণিক ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যানে নাট্যকার যুক্ত করেছেন আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্ব, বেদনা ও রোমান্টিক আবেগ। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তেই আমরা প্রথমবারের মতো (পৌরাণিক অবয়বের বাইরে) এক নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। এ তরঙ্গিণী, বারাঙ্গনা বলে যার পরিচয়, তার দেহবল্লরীতে নয়, প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বে প্রাণিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গ। রাজত্ব, রাজকন্যাকে ত্যাগ করে ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বিধাহীন চিত্তে। Emotion-এর Purgation পর্যায় পর্যন্ত সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করেছে এই নারী। খরা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে নারী তার প্রজনন প্রক্রিয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছে; ঋষ্যশৃঙ্গ- তরঙ্গিণী কাম থেকে ভেসে গেলো প্রেমের স্রোতে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মানবিকস্তরের সামূহিক বিষয়কে বুদ্ধদেব মিথিক পন্থার সাহায্য যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তা অনন্যসাধারণ; বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন। নাটকে কাহিনীর প্রাকপর্ব শুরু হয়েছে W. B Yeats-এর A Woman Young and Old কবিতার উদ্ধৃতি দ্বারা; যার মধ্য দিয়ে এই চলমান মিথের একটি ক্রমিক বিবর্তনের রেখাচিহ্ন অংকিত হয়েছে :

> I'm looking for the face I had
>
> Before the world was made. (বুদ্ধদেব, ১৪০৫ : ৭)

ঋষ্যশৃঙ্গও Yeats-এর বক্তব্যের সামর্থ্যের প্রতিচ্ছবি। নাট্যকার আমাদের জানাচ্ছেন :

> কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নুতন। ... সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নুতন করে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানিনা; কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী। (বুদ্ধদেব, ১৪০৫ : ৭৫)

বুদ্ধদেব বসু ঋষ্যশৃঙ্গ মিথে স্থাপন করলেন আত্মসংগ্রামের এক দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য, মিথ আর মিথ হয়ে রইল না। ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর যে ভাবান্তর ঘটেছিল তার পূর্বসূত্রে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিতা' কবিতা। বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাট্য পরিকল্পনায় ঋষ্যশৃঙ্গ-বিষয়ক যে ধারণা প্রকাশ করলেন তা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবরঞ্জিত। তাঁর ভাবনা আমরা 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কবিতায়ও লক্ষ করি। যথা:

> স্বপ্নে দেখি সেই স্বর্গ, সেই উন্মীলিত মুহূর্ত
> সূর্যের হৃদয়স্রাবী তমিস্রায় অনন্তকাল মূর্ত -

আর আমি ব্যাপ্ত নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে ;
তৃণ আমি, বটবৃক্ষ আমি, আমিই ব্যাঘ্র ও হরিণ, হিমাদ্রি ও
সবুজ কাকাতুয়া, ... 'আমি হংস, আমি বংশীধ্বনি, আমি সর্বগ ও স্থাণু,
আমি দেবর্ষি ও কিরাত, পঞ্চরত্ন ও জটায়ু –
সেই অনন্তির জ্যোতিঃস্রোতে, সেই বৈভবের অন্তরালে।
(বুদ্ধদেব, ১৯৯৩-৯৪ : ৩৯)

বহমান জীবন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে অবস্থান গ্রহণ করলো। এখানেই বুদ্ধদেবের সফলতা। বুদ্ধদেব বসুর ঋষ্যশৃঙ্গও যেন চলমান মানবমনের নিষ্কামসত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে। রাজা লোমপাদের রাজ্যে বৃষ্টিপাত ঘটানো যে আধিদৈবিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে, তাতে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোগের চরমতম অবস্থায় মানবমনের চরম অতৃপ্তির বিষয়। যেমন :

তরঙ্গিণী: তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ: তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা। ...

ঋষ্যশৃঙ্গ: ..... কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিণী।

তরঙ্গিণী: প্রিয়, আমার প্রিয়তম, আমি কি আর কোন দিন তোমাকে দেখবো না?

ঋষ্যশৃঙ্গ: আমাকে বাঁধা দিয়োনা, তরঙ্গিণী। তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে। (বুদ্ধদেব, ১৪০৫ : ৩৯ ও ৭৫)

সুনিপুণ শব্দ-বিন্যাস, সংলাপ-যোজনা এবং গভীর বোধসঞ্চারী বাকভঙ্গির সাহায্যে উদ্ভাসিত হয়েছে কুমার ঋষ্যশৃঙ্গের মানুষিক চৈতন্য, প্রকাশিত হয়েছে দেহবিলাসী তরঙ্গিণীর আত্মিক উন্মেষের রূপ, বিশেষত কামনার চক্রব্যূহে অবরুদ্ধ না থেকে অতিদ্রুত সেখান থেকে উত্তরণ ঘটেছে কামনাহীনতায়। বস্তুত, মানবাত্মার এই হাহাকার-সঞ্চারী অনুভূতিকে এক বিশিষ্ট দার্শনিকতার রসে পরিপুষ্ট করে বুদ্ধদেব *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র ঋষ্যশৃঙ্গকে বহমান প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ দায়িত্ববোধের মধ্যে এনে তার এক বিশিষ্ট সমগ্রতা প্রদান করেছেন। যেমন :

> ঋষ্যশৃঙ্গ : তরঙ্গিণী, শোনো। আমার সেই দৃষ্টি, যা তোমাকে স্বপ্নেও কষ্ট দিয়েছে, তা আর আমার চোখে ফিরে আসবে না। কিন্তু তোমার সেই অন্য মুখ হারিয়ে যায়নি, তুমি তা ফিরে পেতে পার। দর্পণে নয়, হয়তো অন্য কারো চোখেও নয়– কোথায়, আমি তা জানি না; কিন্তু এ-কথা জানি যে কোথাও, কোনো অন্তরালে সেই মুখ চিরকাল ধ'রে আছে, চিরকাল ধ'রে থাকবে। তা খুঁজতে হবে তোমাকেই, চিনে নিতে হবে তোমাকেই মনে আশা রেখো। হৃদয়ে রেখো আনন্দ। (বুদ্ধদেব, ১৪০৫ : ৭৪)

এই আনন্দের মধ্যে তরঙ্গিণী নিজেকে চিনেছে, তাই সে বলেছে :

> আমার আর সহ্য হলো না। আমি তোমাকে আর-একবার দেখতে এলাম। আমাকে তুমি চিনতে পারছো না? দ্যাখো – সেই বসন, সেই ভূষণ, সেই অঙ্গরাগ, আর-একবার বলো, 'তুমি কি শাপভ্রষ্ট দেবতা?' বলো, 'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে'। আর-একবার দৃষ্টিপাত করো আমার দিকে।... আজ আমি পাদ্য অর্ঘ্য আনিনি, আনিনি কোনো ছলনা, কোনো অভিসন্ধি-আজ আমি শুধু নিজেকে নিয়ে এসেছি, শুধু আমি – সম্পূর্ণ, একান্ত আমি। প্রিয় আমার, তুমি আমাকে নন্দিত করো।(বুদ্ধদেব, ১৪০৫ : ৬৯-৭০)

মিথকথার ক্রম-রূপান্তর আধুনিক সাহিত্যকে বিশেষ অবস্থান প্রদান ও সাহিত্যিক কাঠামোকে নতুন মাত্রায় ও নান্দনিকতায় পর্যবসিত করে মানবিক স্তরের বিশেষ ব্যঞ্জনার প্রবাহকে উদঘাটন করে; যাতে প্রোথিত থাকে সামাজিক অবকাঠামো ও তার গুণগত ও মাত্রাগত অবস্থান। Claude levi-strauss তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'Structural Anthropology* গ্রন্থে এ বিষয়ে জানাচ্ছেন :

> ... Mythology would be held to be reflection of the social structure and of social relations. And if observation contradicts the hypothesis. They will immediately suggest that the proper object of myths is to offer a derivation to real but compressed I sentiments. Whatever the real situation, a dialectic that wins at every turn will find the way to hit on the meaning. (Claude, 1958 : 229)

সামাজিক অবকাঠামোগত অবস্থান ও মানবমনের গভীরতলসমূহকে (deep-structure) শ্রেণিগত মান বিবেচনায় সমরেশ মজুমদার *নবীন সন্ন্যাসী* উপন্যাসে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা উপস্থাপন করলেন এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। Literary text ধারণাকে বহুকৌণিকে সমরেশ জটিল মনস্তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করে মিথিকপন্থার এক ভিন্ন আবহ সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের কালপরিক্রমায় দুটি মহাযুদ্ধ মানব সমাজে নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করেছিল এবং পরবর্তীকালে যন্ত্রসভ্যতায় প্রাগ্রসর মননবৃত্তি এক নতুন তাৎপর্যে জীবনকে অনুভব করতে লাগলো। যুদ্ধে, ধ্বংসপ্রবণ সভ্যতার যান্ত্রিকতায় অন্তঃসারশূন্য পরিপ্রেক্ষিত তথা আধুনিক মানুষের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুসত্তা ও খণ্ডিত জীবনবোধ আধুনিক লেখকদের মিথের কাছে প্রত্যাবর্তন ঘটালো। বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ত্রিশের দশক থেকেই সচেতনভাবে সাহিত্যিকেরা সাহিত্যকর্মের আখ্যান পরিকল্পনায় মিথকথার শরণ নিতে শুরু করেছেন। তাঁরা সাহিত্যে আবিষ্কার করেছিলেন আধুনিক মানুষের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ও বিচ্ছিন্ন সত্তাকে। কারণ আত্মচৈতন্যে 'মিথ-চেতনাই' সঞ্চারিত করতে পারে শাশ্বত মানব-মূল্যবোধ। এই ধারণাকেই প্রাধ্যান্য দিয়ে মিথের ব্যবহার হয়ে উঠল তাৎপর্যমণ্ডিত। এই শাশ্বত মানবের মূল্যবোধই বহু কৌণিকে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে। ঋষ্যশৃঙ্গ যেন মানবের আশা-আকাঙ্ক্ষায় নতুন অবয়বের অবতার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সমরেশ মজুমদারও তাঁর লক্ষ্যবস্তুতে এই অবতারকে এনেছেন পূর্বোক্ত পথের বিন্যস্ত বাগান থেকে।

ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথার অন্তর্গূঢ় বিষয় পর্যবেক্ষণে লক্ষণীয়, কাহিনির ব্যঞ্জনার্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপাপবিদ্ধ মানবাত্মার জটিল জীবনাভিযানে। মানবীয় জৈব-মনস্তত্ত্ব সমুৎসুক হয়েছে আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মিক উত্তরণের পথ খুঁজতে। এসবের মধ্যে সমন্বিত সহাবস্থানে অপার্থিব প্রেরণা নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করেছে। ঋষ্যশৃঙ্গ মিথের যে রূপান্তর তা ভারতীয় সংস্কৃতির দার্শনিকতা এবং আত্মিক জাগরণের যে সংহিতা তার সীমারেখার মধ্যে ঘটেছে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আমরা দেখি কাল থেকে কালান্তরে মানবের নিত্য বা শাশ্বত জীবনদর্শনে বহুমাত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রমূলে একান্তভাবে অনিরুদ্ধ যে প্রগাঢ় কামশক্তি রয়েছে তার শক্তিই প্রকৃতির উর্বরতা, সামর্থ্যের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মানবসত্তা এই কামলব্ধ জৈব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাই সে কামনার জাল ছিন্ন করে ইন্দ্রিয়াতীতকে স্পর্শ করার আকুতি প্রকাশ করে। এই আত্ম-আবিষ্কারের যে অপরিসীম উদ্দীপনা তা বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালন করেছে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথা। সমরেশ মজুমদার এই বিষয়টি আত্মস্থ করেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিবেশে দার্শনিক অবস্থা ও আত্মিক উন্নয়নের যে মীমাংসা উপস্থাপিত হয়েছে তার সীমারেখার মধ্যেই নবীন সন্ন্যাসীকে দাঁড় করিয়েছেন নতুন মাত্রায়। আমরা স্মরণ করতে পারি, মাতৃহন্তারক পরশুরাম ও অজ্ঞানে অয়দিওপৌসের মাতৃ-সম্ভোগের পরে বিকারগ্রস্ততার কথা। মনোবিকলনের পথ ধরে এই যে মানবের মনস্তাত্ত্বিক বোধের বিপর্যয় তা আমরা *নবীন সন্ন্যাসী*তেও লক্ষ করি। রবীন্দ্র- শরৎ- বুদ্ধদেবের মিথচর্চার চেয়েও সমরেশের মিথচর্চা সম্পূর্ণ আলাদা। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে তাঁর নায়ক আধুনিক মানুষের মনসিজ দ্বন্দ্বেরই প্রতিরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রারম্ভেই সাহিত্যে বাস্তবতার ও জীবনের নানান অনুসন্ধিৎসার যে ছোঁয়া লেগেছিল তারই ধারাবাহিকতায় *নবীন সন্ন্যাসী* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক খুঁজলেন পৌরাণিক ঘটনায় নতুন জীবনের পথ। এখানে ঋষ্যশৃঙ্গ এসেছে ভিন্নরূপে – শৃঙ্গহীন, ক্ষমতাহীন, ভোগলালসায় মত্ত, যন্ত্রণাদগ্ধ এক মানুষ হিসেবে; যে কি-না বিচ্ছিন্নতায় দগ্ধ একজন মানুষ। অনেকটা বুদ্ধদেব বসুর *ইক্ষাকু সেন্নিন*-এর ইক্ষাকুর মতো। সমরেশ মজুমদার মিথকে সরাসরি গ্রহণ না করলেও পুরাণের কাহিনির নতুন মূল্যায়ন করলেন। শ্রেণিবিভাজিত সমাজের শোষণ এবং আত্মদানের পরস্পর বিপ্রতীপ প্রবণতাকে তুলে ধরলেন তিনি। তাঁর মিথ-চিন্তনের মূল প্রবণতা বহমান ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক জাগরণের নবমূল্যায়ন করা। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, পল্লব সেনগুপ্তের 'কালকূটের পুরাণ-অন্বেষা' প্রবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ :

> বুদ্ধদেবের মতন ইনটেলেকচ্যুয়ালিজমের খ্যাতি তাঁর নেই ঠিকই; কিন্তু অসাধারণ শিল্পদক্ষতা এবং সুপ্রচুর অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে সেই 'ঘাটতি'-র পরিপূরণ হয়ে

> গেছে নিঃসন্দেহেই। ... প্রচলিত অর্থে ইনটেলেকচ্যুয়ালিজম বলতে অবশ্য যা আমরা বুঝি, সমরেশের লেখায় তার ব্যাপক প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু পাণ্ডিত্যকে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সমার্থক বলে না গণ্য করলে, তাঁর এই সব লেখার মধ্যে বুদ্ধির এক দীপ্তিমান আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় যে, তাতে সন্দেহ নেই। জীবনের অন্বেষাকে পুরাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই সেখানে সমরেশ কলম ধরেছেন। কখনো তা গোত্রভুক্তও হয়েছে। (চন্দ্রমল্লী, ২০০১ : ১৭১)

তাঁর *প্রাচেতস* উপন্যাসে দস্যু রত্নাকরের জীবন-উত্তরণকে তত্ত্বজ্ঞানের সামনে হাজির করেছেন, *অন্তিম প্রণয়* উপন্যাসে *মহাভারতের* বিচিত্রবীর্যকে পিতৃত্বে অক্ষম রূপে এঁকেছেন। পাণ্ডু চরিত্রেও এই অক্ষমতাকে আঁকলেন অলৌকিকত্বের মায়াডোরে নয়, জন্মগতভাবে অশক্ততা ও অক্ষমতা হিসেবে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। ঔপন্যাসিক পুরাণের চরিত্র অনুসন্ধানে ইতিহাসের যে পথে হেঁটেছেন তা মূলত মহাকালের সত্যের পথে মানুষের চিরন্তন চলমানতার পথ। তিনি নিজেই যেন মিথের বিবর্তিত সত্যানুসন্ধানী মানুষের প্রতীক। তিনি অন্তর্যামী দৃষ্টিকোণের সঞ্চারী বাতায়নে (Shifting Point of View) দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে নিয়ে গেলেন সত্যের খোঁজে, যা সমাজ নির্দিষ্ট কালিক সত্য নয়। সমাজের নাগপাশমুক্ত ধ্রুব ও চিরকালীন সত্য এবং ঐতিহ্যের তরঙ্গাঘাতে কূলে পৌঁছানো ঋষ্যশৃঙ্গকে। ভোগবাদিতার আত্মস্বরূপের মধ্যেই যেন আবিষ্কার করলেন মানবের বোধিসত্তাকে।

*নবীন সন্ন্যাসী*তে আমরা দেখি ভোগবাদীর চরমতম অবস্থার রূপায়ণ। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য উপন্যাসে ঋষ্যশৃঙ্গ নতুন রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে যেমন তরঙ্গিণীর চরিত্রায়ণ মুখ্য হয়ে উঠেছিল, এখানে বারাঙ্গনা বেশঘোষার উপস্থিতি ও পরিণতি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান উপজীব্য হয়েছে মানবিক স্তরের কুসীদজিবিতার প্রসঙ্গ। উল্লেখ্য, চেতনার এই বিবর্তন ও বহু কৌণিকে বিশ্লেষণের ধারা আধুনিক মানসিকতারই তীব্র প্রতিফলন। যেখানে প্রযুক্ত হয়েছে যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর কথকতা। কথকতার ধারায় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রূপেই বিবেচিত হয়ে আসছে। *নবীন সন্ন্যাসী*তেও এরই প্রতিফলন দেখা যায়। বিবর্তনের রূপরেখায় ঋষ্যশৃঙ্গ এখানে হৃতক্ষম একজন মানুষ। Tragedy-র নায়ক সমতুল্য আবহ সৃষ্টি হয়েছে নবীন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে। কারণ, পৌরাণিক আখ্যানে ঋষ্যশৃঙ্গ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধর, শৃঙ্গবেষ্টিত, ক্ষমতাধর। সমরেশ নব্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আঁকলেন ভিন্নমাত্রায়। এখানে সে শৃঙ্গবিহীন, আধ্যাত্মিক ক্ষমতাহীন, যন্ত্রণাভোগী একজন বিকারগ্রস্ত সত্তা। দেখা যায় এই সন্ন্যাসী এক পর্যায়ে বোধিসত্ত্ব লাভের সাদৃশ্যে দুঃখের স্বরূপ প্রকটিত করার ধ্যানে মগ্ন। ভোগের আস্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে, মায়ার সীমাহীন অলাতচক্রকে পাশ কাটিয়ে এক নির্লিপ্ত জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছে। কারণ, নবীন সন্ন্যাসীর অদম্য কৌতূহল, দুঃখের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দুর্নিবার প্রয়াস বহমান সত্যকে যেমন জাগ্রত করেছে তেমনি উপন্যাসে মিথকথাকে

নানামাত্রায় বিবর্তিত করেছে। নবীন সন্ন্যাসীরূপী ঋষ্যশৃঙ্গ এখানে অদম্য কৌতূহলী, পিতা কর্তৃক অভিশাপতাড়িত। আধ্যাত্মিক ক্ষমতালোপ, শৃঙ্গচ্যুতি, সর্বোচ্চ ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং চূড়ান্ত ভোগের প্রাবল্যে কুরঙ্গীরূপী মাতৃমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি ঘটনার পরম্পরা তাকে যেন আবদ্ধ করে রেখেছে ফেটিসরা। ফলে, দুঃখের স্বরূপ সন্ধানে তার চৈতন্য বাস্তবমুখাপেক্ষী হয়ে নির্বাণতত্ত্বের সন্ধানে ব্রতী হয়েছে। বেশঘোষাকে তার মনে হয়েছে দুঃখের স্বরূপসন্ধানের পথ। ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন :

> এই মানবী যদি দুঃখের আধার হয় তাহলে তাকেই ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন। জাগতিক সমস্ত দুঃখের মধ্যে মানবী যদি সেরা দুঃখদায়ক হয় তাহলে একটি মানবীকে অধিকার করতে পারলেই দুঃখকে জানা যাবে। (সমরেশ, ১৯৯৩ : ১৭৫)

অদম্য কৌতূহলী নবীন সন্ন্যাসীরূপী ঋষ্যশৃঙ্গ ভোগবাদের আত্যন্তিকতায় হৃতক্ষম ও অনিঃশেষ যন্ত্রণাভোগী একজন মানুষ। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী তরঙ্গিণী যেভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন নিজেকে, আলোচ্য উপন্যাসে বেশঘোষাকেও অনুরূপ দেখি। বেশঘোষার সংগীত মূর্ছনায় ঋষ্যশৃঙ্গ কম্পিত হয়েছে, মায়ার ছলনায় আবদ্ধ করেছে নিজেকে; আবিষ্কার করেছে ধীরে ধীরে তার তপের শক্তি হ্রাস হওয়াকে। বারবিলাসিনী দর্শনে মুহূর্তেই কামনার রাহু পূর্ণচন্দ্ররূপী ঋষ্যশৃঙ্গকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাদের কথোপকথনে উঠে এসেছে মানবের পরিচয় :

> আপনি কি মানুষ না দেবতা?
>
> আমি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ।
>
> ... কিন্তু আপনাকে দেখামাত্র আমার হৃদয় চঞ্চল হচ্ছে কেন?
>
> (সমরেশ, ১৯৯৩ : ১৬৯)

এই মানবসত্তায় মদন-মত্ত বেশঘোষা ও ঋষ্যশৃঙ্গ আচ্ছন্ন হয়ে রইলো কামনার ইন্দ্রজালে। নবীন সন্ন্যাসী-বেশঘোষা যখন মিলিত হয়েছে, ঠিক তখনই প্রবীণা বারঘোষাকে দেখে নবীন সন্ন্যাসীর অন্তর বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। আর বেশঘোষার প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে নবীন সন্ন্যাসীর মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা মানবদেহের জৈবিক উত্থানের চিত্র। ঋষ্যশৃঙ্গরূপী নবীন সন্ন্যাসীর মধ্যেও অঙ্গরাজ্য দর্শন রাজকুমারী শান্তাকে বিবাহ ইত্যাদি উপযোগ তাকে প্রেমের স্বরূপ উদ্বোধনে সচেষ্ট করেছে। ঔপন্যাসিক তাই সচেতনভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরলেন : 'নবীন সন্ন্যাসী পৃথিবীর মানুষের জীবন ধারণের সাধনার সবচেয়ে জটিল প্রক্রিয়াটির কোন অর্থ বুঝতে পারছিল না। সে শুধু মনে মনে উচ্চারণ করছিল, ভা-ল-বাসা'। (সমরেশ, ১৯৯৩ : ২২৭) কিন্তু জরা, শাপ, জ্বালাময় এ জীবনে সে কাকে

ভালোবাসে? জীবনের এই ভোগবাদী অবস্থার চরম পর্যায় নবীন সন্ন্যাসীকে দুঃখের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী করে তুলেছে। মূলত যুগ-যন্ত্রণাই ব্যবচ্ছেদকৃত নবীন সন্ন্যাসীর অন্তরাত্মায় কাতর ধ্বনি প্রকাশ করেছে। বিবর্তনের শীর্ষবিন্দুও এস্থানেই চিহ্নিত হয়ে যায়। যন্ত্রণাদগ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ পথ চলতে-চলতে অদম্য কৌতূহল ও দুঃখের স্বরূপ সন্ধানের মধ্য দিয়ে নির্বাণ লাভের প্রচেষ্টায় ঋষ্যশৃঙ্গ-মিথ নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিজলী-সত্যেন্দ্র, ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণী যে পথে ধাবমান হয়েছে - নবীন সন্ন্যাসীর পথ তা থেকে ভিন্ন। তার ক্রমবিবর্তমান পরিণতি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে যেখানে কোনো দৈব-প্রেরণাবশত নয় কিংবা কোনো আধ্যাত্মিকতার সূত্র ধরেও নয় একজন মানুষের মৌলিক পরিণতির মতোই উপস্থিত হয়। মানব মনের চেতন বা অবচেতন স্তর যখন কুসীদজিবিতায় পূর্ণ হতে থাকে তখনই প্রবল ভোগবাদিতার মধ্যে থেকেও নৈরাশ্যবাদিতার সৃষ্টি হয়। জীবনের এ পর্যায়ে নিঃসঙ্গতাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত অলৌকিকতায় নয় বা প্রেমের নিষ্কাম তত্ত্বের উদ্ভাবনের প্রয়াসেও নয়, তার চাওয়া হয় : 'আমি মাতৃ হন্তা। ঈশ্বর আমাকে নিহত করুন'। (সমরেশ, ১৯৯৩ : ১৬৯)

নবীন সন্ন্যাসীর এই ট্রাজিক পরিণতি গ্রিক সাহিত্যের নায়কদের করুণ পরিণতিকে স্মরণ করায়, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিয়তির দুরতিক্রম্যতার কথা। 'পতিতা' কবিতায় আমরা দেখি বহুভোগ্যা নারীর একনিষ্ঠ আত্মিক প্রেমানুভূতি, পণ্য থেকে পূজ্য হয়ে ওঠার সুখ-স্মৃতি এবং নারীর নিজ অস্তিত্ব অনুসন্ধানের এক গভীর মানবীয় আকুতি। অপাপবিদ্ধ ঋষির কাছ থেকে পূজা গ্রহণের সৌভাগ্যই তাকে নবীন মানবীতে রূপান্তরিত করেছে। তরঙ্গিণীরও একই পরিণতি ঘটেছে, কামনার বাতাবরণে জীবনচালনায় ঋষ্যশৃঙ্গের প্রেম তাকে কামের পথ থেকে নিষ্ক্রান্ত করেছে; আহ্বান জানিয়েছে অন্তহীন পথের যাত্রী হবার। 'আধাঁরে আলো'র বিজলী-সত্যেন্দ্রর গতিপথও একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। বেশঘোষার পরিণতি অনুরূপ না হলেও পরিণতির ইতিবৃত্ত আঁকা হয়েছে একই পথের আবর্তনীতে। কক্ষবিন্দুতে যে ঋষ্যশৃঙ্গ রয়েছে তার অবস্থান 'পতিতা', *তপস্বী-তরঙ্গিণী* ও *নবীন সন্ন্যাসী*-তে নতুন-নতুন মাত্রা পেয়েছে, বিশেষভাবে *নবীন সন্ন্যাসীতে*। এখানে ঋষ্যশৃঙ্গকে ইন্দ্রিয়জ অনুভব থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির আকাঙ্ক্ষায় নয়, নিয়তির অমোঘ পরিণতিতে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে সবকিছু। জীবনে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে পিতা বিভাণ্ডকের অভিশাপ এবং পুত্রপ্রাপ্তি। নবীন-বন্ধন-রূপ শৃঙ্গহীন নবজাতকই যে তার দুঃখের স্বরূপ উন্মোচন করবে সে বিষয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের আর কোন সংশয় থাকে না। উপন্যাসের অন্তিমে এসে এই চরম বার্তাই উপস্থাপিত হয়েছে :

> সে ধীরে ধীরে উঠে কাছে যেতে বিভাণ্ডক বললেন, 'লক্ষ করো। কি পবিত্র এ। এই পুত্রকে লালন করে, ভূপতির সমস্ত প্রিয়কার্য সর্ব প্রযত্নে সম্পাদন করে তুমি কাননে

> ফিরে যাবে। তোমার আহত পাপের শাস্তি তোমাকে এ জন্মেই পেতে হবে। প্রতিদিন তুমি যে দুঃখ পাবে তা পূর্ণ হবে এই শিশু সাবালক হলে। এই সংসার যখন তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে তখনই দুঃখের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। (সমরেশ, ১৯৯৩ : ২৪৬)

সমরেশ মজুমদার আবহমান এই জনপ্রিয় মিথকথাকে পৌরাণিক আলো-ছায়ার জগৎ থেকে মর্ত্যমানুষের জীবনলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দুঃখের তরঙ্গাঘাতেই যেন মুক্তির এক অবশ্যম্ভাবী বার্তা আমাদের কানে এসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সাহিত্যের নন্দনালয়ে এই বার্তা নতুন দিনের পথকে আলোকিত করে তোলে। বাংলা সাহিত্যে ঋষ্যশৃঙ্গ মিথকথার বিবর্তন ও ব্যবহার ঘটেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে। আগামীদিনেও এ মিথকথা নিত্যনব দার্শনিক অভিজ্ঞানে মণ্ডিত হয়ে উপস্থাপিত হবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

টীকা

১ প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে 'বেদ' শব্দের ধাতু চারটি-জ্ঞানার্থক, লাভার্থক, সত্তার্থক, বিচারার্থক। অকর্মক ও সকর্মক ধাতুর বিচারে 'বিদ' ধাতুই 'বেদ' শব্দের উৎস। যার অর্থ জ্ঞান। এই জ্ঞান, শব্দাত্মক নয়, সাধনযোগ্য। √বিদ্ + ঘঞ - কে একত্র করলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হল – এর দ্বারা জানা যায়। এই সাধনাটি অনুভবরঞ্জিত। যা 'বোধ' অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ, উপলব্ধি বা চৈতন্য। এই চৈতন্যের স্তর তিনটি - মিতত্ব, অমিতত্ব, স্বরত্বরূপ।

দ্রষ্টব্য : ড. বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬১। পৃষ্ঠা-১-৮

২ ক্লথো অন্যতম ভাগ্যদেবী ল্যাচেসিস ও আট্রোপোসের বোন। ক্লথো মানুষের ভাগ্যজাল বয়ন করেন। মানুষের বর্তমান নিয়ন্ত্রণভারও তার হাতে। আট্রোপোস অন্যতম নিয়তিদেবী। তাঁর হাতে রয়েছে একটি চরকা। সেই চরকায় প্রত্যেক মানুষের জন্য তিনি আলাদা-আলাদা সুতো বুনে রাখেন। সেই সুতো কেটে দিলেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। ল্যাচেসিস নিয়ন্ত্রণ করেন মানুষের যৌবন। হেসিওডের পুরাণ অনুযায়ী এরা নিশাদেবী নিক্সের কন্যা।

দ্রষ্টব্য : ফরহাদ খান, প্রতীচ্য পুরাণ, প্রতীক, ঢাকা-১৯৯৬। পৃষ্ঠা-৬, ৫২, ৮৫।

গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০১-২০০২)। *সমালোচনার কথা*, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

কমলেশ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮০)। *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার : বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণী ও ভূমিকা*, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলিকাতা

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৯৭৯)। *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার [সম্পা.], দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত (২০০১)। *মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

নুরুল আলম আতিক [সম্পা.] (১৯৯২)। *'নৃ'* (সাহিত্য ও শিল্প সংকলন), ঢাকা

ফরহাদ খান (১৯৯৬)। *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক, ঢাকা

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭)। *বুদ্ধদেব বসু : কাব্য ও নাটক*, পাইওনিয়ার পাবলিশার্স, কলকাতা

বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯৬১)। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৭)। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু (১৪০৫)। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৯৩-৯৪)। *কবিতা সংগ্রহ-৩*, ভারবি, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮৯)। *'পতিতা'* শঙ্খ ঘোষ [সংকলিত] *'সূর্যাবর্ত,'* বিশ্বভারতী, কলকাতা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৯)। *শরৎ রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা

শামসুদ্দিন চৌধুরী (১৯৯৭)। *অন্য নিরীক্ষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সমরেশ মজুমদার (১৯৯৩)। *সুধারাণী ও নবীন সন্ন্যাসী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

সাদেকুল আহসান [অনু.] (২০০৯)। *পুরাণ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, সন্দেশ, ঢাকা

সুধীরচন্দ্র সরকার [সম্পা.] (১৪১৫)। *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

Levi- Strauss, Claude (1958). *Structural Anthropology* (Vol no-1)

Philip Wheel Wright (1976). *Poetry, Myth and Reality*. An essay in the book. 'Twentieth Century Criticism : The Major Statements [Ed.] William Handy and Max Westbrook. Indian Edition

Roland Barthes (1972). *Mythologies,* selected and translated from French by Annette Levers